প্রত্নতত্ত্ব ঃ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ; আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য। কারণ সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকীয় ভারত-ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সাহিত্যসূত্র সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য হতে পারেনি। আবার সরকারি স্তরে দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের প্রথাও তখন গড়ে উঠেনি। স্বভাবতই প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য ইতিহাস রচনার কাজে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল সমকালের অসংখ্য লেখ। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের লেখই সমকালের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। লেখগুলির মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ লেখগুলি হল প্রতিহার-রাজ মিহিরভোজের

Scanned with CamScanner

'গোয়ালিয়র প্রশস্তি', ধর্মপালের *'খালিমপুর লেখ'*, নারায়ণ পালের *'ভাগলপুর লেখ'*, দেবপালের আমল-সম্পর্কিত *'মুঙ্গের লেখ'* ও *'বাদল-প্রশস্তি'*, উমাপতি ধর রচিত বিজয় সেনের *'দেওপাড়া লেখ'* চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর *'আইহোল লেখ'* ইত্যাদি। লেখর ওপর ভিত্তি করেই চোলদের আমলে প্রচলিত গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা যায়। এ প্রসঙ্গে দশম শতকে রচিত (৯২১ খ্রিঃ) উত্তর-মেরু গ্রামের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিটির নাম উল্লেখ্য। অতিসম্প্রতি (মার্চ ১৯৮৭ খ্রিঃ) মালদহ জেলার জগজ্জীবনপুরে আবিষ্কৃত তাম্র শাসনটি ইতিহাসের নতুন সূত্র প্রদান করে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এই তাম্র লেখটি আবিষ্কারের পর এমন ধারণার জন্ম হয়েছে যে, রাজা দেবপালের পর প্রথম বিগ্রহ পাল সিংহাসনে বসেননি। দেবপালের অব্যবহিত পরেই সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র জনৈক মহেন্দ্রপালদেব। এই তাম্র শাসনে বৌদ্ধদের ভূমিদান সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুগত ছিলেন।

সরকারি লেখগুলি অধিকাংশই ভূমিদান-সম্পর্কিত। জমি বিক্রি বা জমিদান-সংক্রান্ত নানা বিষয় এতে উল্লেখ করা আছে। এদের প্রথম অংশটি প্রশস্তিমূলক। এই অংশে রাজার নাম, বংশপরিচয়, রাজ্যের আয়তন ইত্যাদির বিবরণ থাকে। ভূমিদান অংশে দানকৃত জমির পরিমাপ, রাজস্ব-মূল্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। সরকারি লেখর তুলনায় বেসরকারি লেখর সংখ্যা অনেক বেশি। গুপ্ত-পরবর্তী যুগের বেসরকারি লেখগুলি প্রধানত সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিষয়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাক্-গুপ্ত বেসরকারি লেখগুলির মাধ্যম ছিল প্রাকৃত ভাষা এবং তার কেন্দ্রে ছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। যাই হোক্, বেসরকারি লেখগুলির প্রচারক ছিলেন মূলত উচ্চ সরকারি পদাধিকারী ব্যক্তিগণ। এগুলির বিষয়বস্তু মুখ্যত ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে 'ব্রহ্মদেয় দান' কিংবা মন্দিরের উদ্দেশ্যে 'দেবদান'-সম্পর্কিত। তবে উচ্চপদাধিকারীদের বংশপরিচয়, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মচেতনা ইত্যাদি বিষয়ে ইতিহাসমূলক তথ্য অর্জনে এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মুদ্রার গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর মুদ্রার গুরুত্ব হ্রাস পায়। সম্ভবত, এ সময় মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পেয়েছিল। পাল, প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট রাজারা খুব কম মুদ্রার প্রচলন করেন কিংবা আদৌ করেননি। সপ্তম শতকের পর থেকে একাদশ শতকের মধ্যবর্তী কালে অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত সমতট-হরিকেল অঞ্চলে কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে পোড়ামাটির জিনিসপত্র, বুদ্ধমূর্তি, মন্দিরের অবশেষ ইত্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায়, যা সমকালের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ, অজয় নদীর তীরে গড়ে-ওঠা 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' ইত্যাদি আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with CamScanner